Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 48–55
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

লোকনাথ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প : মধ্যবিত্তের মানস সংকট

অহনা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ই-মেইল : royahana073@gmail.com

Keyword
ছোটগল্প, মধ্যবিত্ত, মানস সংকট, বৃত্তযাপন, আত্মবন্দী, উত্তরণ, অস্তিত্ব।

Abstract
ছোটগল্পকার লোকনাথ ভট্টাচার্য মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী লেখক। এই সময়ে মধ্যবিত্ত মানসের সংকটের ছবি প্রধানত উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। লোকনাথ ভট্টাচার্য মোট ১২টি গল্প লেখেন। তাঁর প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ দুটি। প্রথমটি 'প্রেম ও পাথর' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩-এ। দ্বিতীয়টি ২৫ বছর পর ১৯৯৮ এ প্রকাশিত হয়। গল্পসংকলনটির নাম 'আপনার কীর্তি'। গল্পগুলিতে মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবন যাপনের কথা নয়– মূল্যবোধের সংকট, অস্তিত্বের সমস্যা, মনোজগতের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে। ফরাসী দেশে দীর্ঘদিন থাকার জন্য ঐ দেশের সাহিত্য আন্দোলনের সংগে নিবিড় পরিচয় ছিল লোকনাথ ভট্টাচার্যের। তার প্রভাব তাঁর গল্পে আছে। আবার আজন্ম রক্ষনশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের আচার নিষ্ঠায় বড় হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বা পুরাণ ইত্যাদির কথাও বারবার তার লেখায় এসেছে। আধুনিক মানুষের সম্পর্কের জটিলতা লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনেক গল্পের কথা বস্তু। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, বিশ্বাস দুটি মানুষের বিশেষ করে দাম্পত্য সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। এই সময়ে সম্পর্কের সেই বুনট কখন কোন্ তন্ত্রীতে ঘা লেগে ছিঁড়ে যায়, রক্তাক্ত হয়ে ওঠে তা যেন মানুষের নিজেরই অজ্ঞাত। সেই বিশ্বাসহীনতার কথা কখনো কোনো কোনো গল্পের বিষয় হয়েছে আবার কখনো কোনো গল্পে আছে নিজেকে জানার বা আত্মআবিস্কারের কথা। আধুনিক সময়ে মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা বা বৃত্তযাপন এবং নিরাপদ বলয়ে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা মানুষে মানুষে যে দূরত্ব সৃষ্টি করে লোকনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গল্পে সেই মানুষের ছবিকেও এনেছেন। মধ্যবিত্ত মানুষের দহন কথাই প্রধানত তাঁর গল্পের কথাবস্তু। লোকনাথ ভট্টাচার্য ফ্রান্সে দীর্ঘদিন থাকার ফলে ঐ দেশের নানা সাহিত্য প্রবণতা বা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর গল্পের রচনা ভঙ্গীতে সেই সব প্রবণতার প্রভাব রয়েছে। এর ফলে কখনো এসেছে অস্তিবাদী চেতনার প্রভাব, কখনো এসেছে ফরাসী নব্য সাহিত্যের প্রভাব আবার কখনো ফরাসী গোয়েন্দা গল্পের উত্তেজনা। এক নতুন ভাবনা ও আঙ্গিক সচেতনতা তার গল্পগুলিকে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। আসলে লোকনাথ ভট্টাচার্যের অধিকাংশ গল্পই এক হিসেবে মধ্যবিত্তের আত্মউদঘাটনের বা আত্মজিজ্ঞাসার। লেখক নানান দৃষ্টি কোন থেকে মধ্যবিত্তের আত্মসংকটকে আমাদের দেখান। 'দুই রাতের হাসনাহানা', 'কারারুদ্ধ', 'অসুখ', 'আপনার কীর্তি' প্রভৃতি গল্পগুলিতে একদিকে মধ্যবিত্ত মানসের সংকট অন্যদিকে তা থেকে উত্তরণের কথা লেখক দেখিয়েছেন। গল্পগুলির পর্যালোচনায় লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায়।

Discussion

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসেবে লোকনাথ ভট্টাচার্যের আবির্ভাব সাতের দশকে। যদিও বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত পাঁচের দশক থেকেই। দীর্ঘদিন বিদেশে বসবাসের সূত্রে বাংলা সাহিত্যে তিনি খুব যে পরিচিত তা নয়। এছাড়া তার রচনার যে অভিনবত্ব তা বাঙালী পাঠকের চিরপ্রচলিত ও অভ্যস্ত সাহিত্যচর্চার সঙ্গেও খাপ-খায় নি। কথাসাহিত্য, নাটক, কবিতা, ছোটগল্প –প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় এই অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে দীর্ঘকাল ফ্রান্সে বসবাসের ফলে ঐ দেশের সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। হয়তো সে কারণেই তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রচলিত রীতির ছাপ ছিল না। তবে ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি বিস্মৃত হননি। তাঁর সাহিত্যপাঠে একাধারে পশ্চিমী প্রভাব ও ভারতীয় ঐতিহ্যের মিলন লক্ষ করা যায়।

লোকনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন প্রখরভাবে সময় সচেতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির যে সংকট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সে সম্পর্কে তিনি শুধু ওয়াকিবহালই ছিলেন না, গভীরভাবে চিন্তিতও ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যুদ্ধোত্তর কালে মধ্যবিত্তের অন্তরসঙ্কটকে। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রধানতঃ ব্যক্তির সেই অর্ন্তলোকেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। একসময় নিজের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন-

> "... বাস্তবধর্মিতায় আমার আগ্রহ কম, বিশ্বাস কম। বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত সংসারের চিত্রাঙ্কণ আমার ক্ষমতার বাইরে। আগ্রহেরও সম্পূর্ন বাইরে।"[১]

বাস্তবিকই তাঁর সৃষ্টিকর্মে তথাকথিত মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবন চিত্রাঙ্কন কম। কিন্তু গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক সর্বত্র মধ্যবিত্তের দুঃসহ মানস যন্ত্রনা, আত্মসঙ্কট, বৃত্ত যাপনের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আত্মবন্দী মধ্যবিত্তের সত্তার দুঃসহ সঙ্কটের প্রকাশ প্রবল হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার সময় ভারতবাসী এক আত্মনির্ভর দেশের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে দুটি দশক যেতে না যেতেই ভারতবাসীর সেই স্বপ্ন হতাশায়, ব্যর্থতায় পরিণত হয়। ছয় ও সাতের দশক সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ঘটনায় উত্তাল। বাঙালির জীবনে সেই অভিঘাত আছড়ে পড়েছিল প্রবল বেগে। দুটি যুদ্ধ, খাদ্য-আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, জরুরী অবস্থার ঘোষণা, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাঙালির জীবনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমশঃই হতাশায় পরিণত হচ্ছিল। লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রত্যক্ষ করেছেন এই সময়কে। ছয় ও সাতের দশকে এই সব অভিঘাত বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসে তীব্র সংকটের সৃষ্টি করে। সংশয়, অবিশ্বাস, সন্দেহ নষ্ট করে দেয় মানুষের শুভ চেতনা ও সম্পর্ককে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে এই মানস সংকটেরই প্রতিফলন দেখা যায়।

লোকনাথ ভট্টাচার্য মোট ১২টি গল্প লেখেন। দুটি গল্প গ্রন্থ। প্রথমটি 'প্রেম ও পাথর' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ এ। এতে নয়টি গল্প আছে। দ্বিতীয়টি ২৫ বছর পর ১৯৯৮-এ 'আপনার কীর্তি', এতে তিনটি গল্প আছে। এছাড়া একটি অগ্রন্থিত গল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। গল্পগুলি প্রথাবদ্ধ রীতির গল্প নয়। গল্পগুলিতে মধ্যবিত্তের যাপন কথা নয়– মূল্যবোধের সংকট, অস্তিত্বের সমস্যা, মনোজগতের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে। ফরাসী দেশে দীর্ঘদিন থাকার জন্য ঐ দেশের সাহিত্য আন্দোলনের সংগে নিবিড় পরিচয় ছিল লোকনাথ ভট্টাচার্যের। তার প্রভাব তাঁর গল্পে আছে। আবার আজন্ম রক্ষনশীল ব্রাহ্মন পরিবারের আচার নিষ্ঠায় বড় হওয়ার জন্য ব্রাহ্মন্য সংস্কৃতি বা পুরাণ ইত্যাদির কথাও বারবার তার লেখায় এসেছে। গল্পগুলিতে যা প্রধানত লক্ষ্য করা যাচ্ছে –

১. মধ্যবিত্তের মানস সংকট – জীবন চিত্র নয়।
২. অস্তিত্বের সংঘাত
৩. প্রচলিত মূল্যবোধ বা সংস্কারের সংকট ও সংঘর্ষ
৪. মনোজগতের নানা সমস্যা
৫. সমস্ত গল্পেই আছে এক আপাত নিস্তরঙ্গ আবহাওয়া। অথচ তার তলে আছে প্রবল ঘূর্নি।

ভাষাগত দিক থেকেও লোকনাথ ভট্টাচার্যের গল্পগুলি অনবদ্য। বীতশোক ভট্টাচার্যের মতে লোকনাথ ভট্টাচার্যের গল্পের ভাষা,

> "... কোথাও নাট্যভাষা, কোথাও গীতিময় এবং শেষ পর্যন্ত এক ধ্বনিমূর্চ্ছনার অনুসরণে নিঃসঙ্গে এগিয়ে চলবার ভাষা - নাছোড়, স্বচ্ছ এবং রহস্যময়।"[২]

লোকনাথ ভট্টাচার্যের প্রথম গল্পসঙ্কলন 'প্রেম ও পাথর'। এই গল্পসঙ্কলনের প্রথম গল্প 'আর্শীবাদ'। গল্পটি আত্মকথনরীতিতে লেখা। লেখকের বয়ানেই সমগ্র গল্পটি পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে ছবির মত। গল্পের শুরুতে দেখা যায় লেখক গিয়েছেন সুরেশবাবু বলে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। তাদের দুজনের মধ্যে যোগসূত্র নীলিমা বলে এক ভদ্রমহিলা, ঘটনাসূত্রে তিনি দুজনেরই স্ত্রী। লেখকের কথাতে আমরা জানতে পারি, যখন তার স্ত্রী আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা, সেই সময় তিনি তার কাজের সূত্রে আমেরিকায় চলে যান। যেখানে তার দীর্ঘ তিন বছরের অবস্থান। ঠিক সেই মুহূর্তে সুরেশবাবুর সাথে নীলিমাদেবীর এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্কের পরিণতিতে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন। লেখক ফিরে এলে দৃঢ়চেতা নীলিমা দেবী সব সত্য অকপটে স্বীকার করেন। ঘটনার পারম্পর্যে অন্তঃসত্ত্বা নীলিমা দেবী তার শিশুকন্যা অনুরাধাকে তার পিতার কাছে রেখে সুরেশবাবুর কাছে চলে যান। সেখানে তার পুত্র সুনীলের জন্মের পর তার মৃত্যু হয়। দীর্ঘ ২৫ বছর স্মৃতি রোমন্থন করে জীবন যাপন এই দুই পুরুষ চরিত্রের। গল্পের প্রায় শেষাংশে গিয়ে অদ্ভুত এক মোচড় লক্ষ্য করা যায়। যেখানে কথকের সূত্র ধরে জানা যায় তার এবং সুরেশ বাবুর সন্তানেরা পরস্পর প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ। ভাগ্যের চরম পরিহাসে নিজেদের প্রকৃত সম্পর্ক না জেনেই সুনীল-অনুরাধা এমন এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে যার ভবিষ্যত অনেক প্রশ্নচিহ্নের মুখে। গল্পটি শেষ হয় লেখকের অসীম ক্ষমাশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়কে সামনে রেখে, যেখানে সব কিছু জেনেও এক উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রাখেন এক পিতা। গল্পটির টেকনিক একোক্তি জাতীয়, উত্তম পুরুষের বয়ানে কথক পিতা অন্য একটি চরিত্রকে সম্বোধন করে সমস্ত ঘটনা জানাচ্ছে এক আবেগহীন বিবৃতিতে। নিজের কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করে কথক পিতা ঘটনার সূত্র ছেড়ে দিলেন শ্রোতা পিতার ওপরে। গল্পের শেষাংশে বলেন,

> 'উঠি এবার, রাত্রি বেশ হল'[৩]

–সংলাপটি প্রতীকী। আসন্ন এক সংকটকে সামনে রেখে গল্প শেষ। হয়ত কথক অসীম উদারতায়, ক্ষমায়, অস্বীকৃত সম্পর্কের শেষ স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল, এরপর কি সিদ্ধান্ত নেবে অনুরাধা বা সুরেশ বাবু। আর পাঠকেরও পথ চলা এই প্রশ্ন থেকেই। একটি সার্থক ছোটগল্পের মতই অতৃপ্তি নিয়ে এই পথ চলা।

গল্পটি পড়তে গিয়ে মনে হয় এই সময়ে দ্বীপবন্দী যে আধুনিক মানুষ শেষ পর্যন্ত এক অপরিচয়ের গন্ডীতে বৃত্তায়িত হয়, তারই কি পরিণাম ভাই-বোনের সম্পর্কের এই বুননে? লোকনাথ ভট্টাচার্যের গল্পে প্রায়ই এই প্রশ্ন জেগে ওঠে। 'আশীর্বাদ' গল্পটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রধানতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী লেখক। এই সময় মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম একটি প্রবণতা একাকীত্ব। 'বার্ষিকী' গল্পে লোকনাথ ভট্টাচার্য এক দম্পতির জীবন অবলম্বনে মধ্যবিত্ত জীবনের এই একাকীত্বের ও সঙ্কটের ছবি তুলে এনেছেন। 'বার্ষিকী' গল্পের পট উত্তোলন হয়েছে গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র তড়িৎ ও গৌরীর বিবাহ বার্ষিকীর দিনে। মধ্যবিত্ত যাপনে অভ্যস্ত গৌরী ও তড়িৎ। তাদের বিবাহবার্ষিকী তারা প্রতি বছরই পালন করে। ছুটির দিন না হলে ছুটিও নেয় তারা। তবু আনন্দে নিরিবিলিতে স্বল্প আয়োজনে নিজেদের মতো করে কাটায়। গল্পের কাহিনি সূত্র প্রথম দিকে চলছিল খুব আলগা ভাবে। কোথাও তরঙ্গ নেই, শান্ত, স্তিমিত। কিন্তু এই আপাত নিস্তরঙ্গতার অন্তরালে কোথাও ছিল তীব্র ঘূর্নি। ধীরে ধীরে গল্পের মোড়ক খোলেন লেখক এবার। সন্তান হারিয়েছে গৌরী ও তড়িৎ অনেকদিন। দীর্ঘ একঘেয়েমির শোকাতুর জীবন তাদের। সবকিছুর মধ্যেও সেই শোক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে। এই শোকই আবার বন্ধন তাদের। তবু হঠাৎ একদিন ঠিক করে তারা,

> "দুজন দু'দিকে চলে যাবে – অথবা একজন চলে যাবে অন্যজন থাকবে। তারা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে আসছিল, যেন মজ্জায় ঘুণ ধরেছে তাদের – তাই আরো একবার চেষ্টা করে দেখবে নতুন করে জীবনটাকে গড়া যায় কিনা।"[৪]

জীবনের আনন্দ দুজনের একত্রে থাকায়, কিন্তু সে তো বাঁধন। তাতে কেবলি সীমার সুর। কিন্তু আজ সর্বহারা হয়ে আদিগন্ত মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়াতে চায় তারা। বন্ধন নয়, সমগ্র পৃথিবী তাদের পায়ের তলায় এসে দাঁড়াবে। আর সেই কঠিন মাটির সংগে বাঁধন জীবনের বহু প্রচলিত বন্ধন। শোক ভাগ করে নিতে হবে দু'জনের মধ্যে। তাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করবে তারা। বরং শোকের কাছে সম্পূর্ণ একলা করে দিতে হবে জীবনকে। ভিন্নভাবে বোঝাপড়া করতে হবে– শোকের সঙ্গে, পরস্পরের পড়ে থাকা জীবনটার সঙ্গে। তড়িৎ তাই বলে,

"জীবন, জানো রাণি তা শূণ্য পৃষ্ঠায় ভরা একটা বই এর মতো, তাতে আমরা যা লিখব, তাই লেখা হবে। এই এক মুহূর্ত যেমন তোমার, তেমনি আমার আজকের এই অনন্য মুহূর্তটি প্রার্থনা কর যেন দুজনেই উত্তীর্ণ হই।"[৫]

আর এই উপলব্ধির মধ্যে তারা আবিস্কার করে বিচ্ছিন্নতার মাঝের বন্ধনকে।

লোকনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গল্পে প্রায়শই আনেন মানুষের উপলব্ধির কথা, আত্মআবিস্কারের কথা। তড়িৎ ও গৌরী নিজেকে আবিষ্কার করে নতুন সম্পর্কে। ছোট গন্ডী থেকে বাইরে গিয়ে বৃহতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আর তার মধ্যে পরিচয় খুঁজে পাওয়ার। 'বার্ষিকী' গল্পটিতে সেই অনুভবেরই প্রকাশ।

আধুনিক মানুষের সম্পর্কের জটিলতা লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনেক গল্পের কথাবস্তু। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, বিশ্বাস দুটি মানুষের বিশেষ করে দাম্পত্য সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। এই সময়ে সম্পর্কের সেই বুনট কখন কোন্ তন্ত্রীতে ঘা লেগে ছিঁড়ে যায়, রক্তাক্ত হয়ে ওঠে তা যেন মানুষের নিজেরই অজ্ঞাত। 'দেশলাই' গল্পটি মানুষের সেই বিশ্বাসহীনতার গল্প। এক আপাত সাধারন কাহিনির মধ্য দিয়ে গল্পটির বিস্তার। গল্পটির উপস্থাপন ভঙ্গী সরাসরি চরিত্রদের বয়ানের মধ্য দিয়ে। এক সুখী পরিবার কামাক্ষী, রমা এবং তাদের তিনবছরের কন্যা সন্তান মীরাকে নিয়ে। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা দেখতে সুদূর হাওড়া থেকে তাদের আগমন এখানে। সেই মেলায় গিয়ে ছোট্ট মীরার নাকের ভেতর পুঁতি ঢুকে যায়। কষ্টে বিবর্ণ হয়ে ওঠে ছোট্ট শিশুর মুখ। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে কামাক্ষী বের করে পকেট থেকে দেশলাই। এখান থেকেই গল্পে সংঘাতের সূত্রপাত। কামাক্ষীর স্ত্রী রমা স্বাধীনচেতা, স্বাবলম্বী, দৃঢ় ব্যাক্তিত্বের অধিকারিনী। তার পছন্দ অপছন্দের জোর তার জীবনে মুখ্য। কামাক্ষীর সিগারেট খাবার বদভ্যেস তার চূড়ান্ত অপছন্দ। এই নিয়েই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব। নেশায় কাতর কামাক্ষী বার বার চেষ্টা করেও এই নেশার কবল থেকে বের হতে অক্ষম। তাই তখন তার নিরূপায় পন্থা মিথ্যার আশ্রয়, লুকিয়ে কার্যসিদ্ধির পন্থা অবলম্বন। ঘটনাচক্রে সেই মিথ্যে নগ্নভাবে বাস্তব হয়ে স্ত্রী রমার সামনে উঠে আসে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্না নারী রমা এই বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়, তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এবং সে বিরূপ হয়ে সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি করে। ঘোরার কোনো আনন্দ না থাকায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। কামাক্ষী ভীরু, মধ্যবিত্ত, ঝামেলা এড়ানো স্বামীর সার্থক চিত্রাংকন । বারবার সে তার স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টায় ব্যর্থ। সম্পর্ক বিচ্ছেদের এক অদ্ভূত আতঙ্ক তার ভেতরে খেলা করে। নিজের শহরের স্টেশনে নেমে তার সমগ্র শহরকেই অচেনা মনে হয়। ব্যক্তিত্ববোধ, মূল্যবোধের পার্থক্য দুটো আধুনিক মানুষের মধ্যে কতটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে সেই আতঙ্কের এক মানসিক চিত্রাঙ্কনে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটান লেখক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা সম্মান হারালে সম্পর্ক রক্তাক্ত হয়। 'দেশলাই' গল্প আধুনিক মানুষের সেই রক্ত ক্ষরণের গল্প।

'দুই রাতের হাসনাহানা' গল্পটি নিরাপদ বলয়ের মধ্যে থাকা মধ্যবিত্ত মানুষের পলায়নী মনোভাবের গল্প। আজকের মধ্যবিত্তের প্রবনতাই হল নিজেকে গুটিয়ে রাখা নিরাপদ বৃত্তে। হয়তো কখনো কখনো বিবেকের দংশন অনুভব করে কৃতকার্যের জন্য। কিন্তু সে যেন বিবেক বিলাসিতা। সেই এক-মুহুর্তের বিবেক দংশনকে কোন অজুহাতে সরিয়ে আবার শামুকের মত খোলায় ঢুকে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। গল্পে দেখা যায় সুবোধ ও আরতির সুখী সংসার ছোট্ট একটি মেয়ে ও সুবোধের বিধবা বোনকে নিয়ে। এক রাতে ছেলে খোকনের জন্মদিনে আনন্দ হুল্লোড়ের পর অনেক রাতে তারা ঘুমোতে যায়। মাঝরাতে নারীকন্ঠের এক আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যায় সুবোধের। পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা ছেলের জন্য চিন্তিত হয়ে দু'জনেই ছুটে যায় ঐ ঘরে। ছেলে বোনকে ঘুমোতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে আবারও শুনতে পায় ঐ চিৎকার, গোঙ্গানির শব্দ। আলো জ্বেলে জানলায় দাঁড়াতেই দেখে একটি লোক পালিয়ে গেল আর রাস্তায় ছুরিকাহত এক বৃদ্ধা। পাশাপাশি বাড়ির জানলায় আলো জ্বলে উঠতে দেখে তারা। এতগুলো জানলায় আলো দেখে বৃদ্ধা সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার করে কিন্তু কেউই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। সুবোধ প্রথমে নিচে নেমে বুড়িকে বাড়ির মধ্যে রেখে বাঁচাতে চাইলেও মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভীতিবোধ তাকে বাঁধা দেয়। স্ত্রী আরতিও দ্বিধাগ্রস্ত হয়। আর স্ত্রীর দিক থেকে সামান্য সহমত পেয়ে সুবোধও যায় না। নিজেকে আড়াল করার জন্য স্বপক্ষে নানা যুক্তি বোনে সে-

১. "বুড়ির সংগে লোকটার কি হয়েছে? কেন সে তাকে ছোরা মারতে গেল? অমনি অমনি? হয়তো বুড়িটাই তার কিছু করেছে আগে।"[৬]

২."হ্যাঁ ছোটজাতের মেয়ে তো, এদের সব ব্যাপার আমরা বুঝিও না জানি ও না। আমি শেষকালে বুড়িটাকে উদ্ধার করতে গিয়ে অন্য কারোর কোন আক্রোশের বস্তু হয়ে দাঁড়াই, শেষে একটা ফ্যাসাদে পড়ি।"[৭]

লোকনাথ ভট্টাচার্যের গল্পে প্রায়ই থাকে এক উপলব্ধি। মানুষ হিসেবে নিজেকে জানার আত্ম-আবিস্কারের কথা। কখনো তা উত্তীর্ণ করে দেয় মানুষকে মনুষ্যত্বে, কখনো তা দহন করে মনুষ্যত্ব বোধকে।

মধ্যবিত্ত জীবনের অপরিচয়ের গন্ডী, বৃত্ত যাপন এ বর্ণনায় উঠে এসেছে। দূর থেকে দেখা জানালার আবছা মূর্তিগুলি মধ্যবিত্তের গন্ডীবদ্ধ জীবনকে তুলে ধরেছে। মূল্যবোধহীন নরকঙ্কালের মত অবয়বহীন ছায়ামূর্তিগুলো অপরিচয়ের বৃত্তে আটকে থাকা আজকের মানুষ। হাসনুহানার গন্ধে বিভোর গভীর রাতে, ঝিরঝিরে হাওয়ায় জনপ্রাণীহীন মধ্যরাতে আবছা আলো-আঁধারীতে পরে থাকা ঐ বুড়ির আর্তনাদ জানলায় জানলায় আবছা অবয়বহীন মানুষগুলিকে মেলাতে পারছে না বরং যেন ঐ পুরনো ক্লিশে অপরিচয়ের ওপর আরো এক গাঢ় প্রলেপ লেপে দিল। আর সেই ছায়া এসে পড়লো সুবোধ-আরতির জীবনে। আরতির ঘৃনা, দূরত্ব, সুবোধের আত্মগ্লানি খুঁজে ফিরল হাসনাহানার গন্ধকে।

গল্পটির নাম 'দুই রাতের হাসনাহানা'। প্রথম রাতে হাসনাহানার গন্ধ সত্ত্বেও ঘটে যায় একটি নৃশংস খুন সকলের চোখের সামনে। আধুনিক মানুষের বৃত্ত যাপন সেই খুনকে রোধ করত পারে না। যাবে কি যাবে না এই সংশয় যখন ঘেরাটোপে থাকা অবয়বহীন জানালার মুখগুলোতে তীব্র হয় তখন সুবোধ অনুভব করে –

> "হঠাৎ হাওয়াটা একটু জোরে হয়ে গেল, এক মুহূর্তের জন্য এবং সংগে সংগে হাসনাহানার তীব্র গন্ধে ঘর ভরে উঠল।"[৮]

ঠিক তখনই সুবোধ আরতিকে বলে 'চল শুতে যাই'। বিবেকের যে ক্ষনিক দংশন হাসনাহানার গন্ধের মতো তীব্র হয়, চকিতে তা মিলিয়ে যেতেও এই আধুনিক জীবনে দেরী হয় না।

আবার গল্পের শেষে যে বন্দীজীবন শুরু হয় তখনও সুবোধ খুঁজতে চায় হাসনাহানাকে। দুটি রাত- প্রথম রাতে একটি খুন, দ্বিতীয় রাতে তার পরিনতিতে আর বন্দীজীবন যাপনের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসার স্ফূরন। প্রতীকী তাৎপর্যে একটি হত্যার সূত্র ধরে মধ্যবিত্তের ভয়ংকর বৃত্ত যাপনকেই লোকনাথ তুলে ধরেছেন গল্পটিতে।

'প্রেম ও পাথর' গল্পটি লেখকের সরাসরি বয়ানে লেখা। কাহিনি দুই বন্ধু দীপ্তেন্দ্র ও সুরেনের। মূল চরিত্র দীপ্তেন্দ্র। মূলতঃ দীপেন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার প্রকাশই এই গল্পে মূল উপজীব্য। দিল্লীতে বড় চাকুরে দীপ্তেন্দ্র, তার চাকুরী জীবন নিয়ে সুখী নয়। তার সংস্কৃতি, চিন্তা, বিচার ভাবনা অনুযায়ী সে তার কর্মজীবন বেছে নিতে পারে নি। তাই ক্রমাগত বদল খুঁজতে থাকে সে। এই সূত্রেই বন্ধু সুরেনের সাথে কথোপকথন শুরু হয় একদিন। পন্ডিচেরীতে কাজের সূত্রে দু'জনের আলাপ এবং বন্ধুত্বের সূত্রপাত। যদিও চিন্তা ভাবনা মূল্যবোধে দু'জন বিপরীত মেরুর মানুষ তবুও পন্ডিচেরীর মত ছোট্ট শহরে কর্মসূত্রেই তাদের ঘনিষ্ঠতা। সময়ের সাথে কর্মজীবনে বদল আসে দীপ্তেন্দ্রর, সে পন্ডিচেরী থেকে দিল্লী বদলি হয়ে যায়। সময়ের কালচক্রে সেখানে আবার সুরেনের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় দীপ্তেন্দ্র জানায় সে তার চাকরীতে সুখী নয়। সুরেন তখন তার জামাইবাবুর সংস্থাতে চাকুরীর জন্য আবেদন জানাতে বলে দীপ্তেন্দ্রকে। দীপ্তেন্দ্র ও সুরেন দু'জনেই ভাবে সেই পদের জন্য দীপ্তেন্দ্র যোগ্যতম ব্যাক্তি। সুরেনের বলে দেওয়া সময়ে এক সকালে নিজের বায়োডাটা সহ দীপ্তেন্দ্র উপস্থিত হয় জামাইবাবুর বাড়িতে। অপেক্ষারত দীপ্তেন্দ্রর নানা মানসিক চিন্তাস্রোতের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন লেখক। দীপ্তেন্দ্রর মনে পড়ে এক নটরাজের মূর্তির কথা। যে মূর্তিটি তার পন্ডিচেরীর সরকারী অফিসে ছিল। এই মূর্তির প্রতি দীপ্তেন্দ্রর অন্যরকম এক ভালোবাসা ছিল। সংস্কৃতিমনস্ক দীপ্তেন্দ্র এক অদ্ভূত মানসিক বন্ধন অনুভব করেছিল সেই মূর্তির সাথে। তার কাছে সেই মূর্তি ছিল ভালোবাসার প্রতীক। সেই সময়ই এই মূর্তি নিয়ে সুরেনের মেটেরিয়ালিলিস্টিক ভাবনা দীপ্তেন্দ্রকে আঘাত করেছিল। সময়ের স্রোতে সেই ঘটনা স্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছিল দীপ্তেন্দ্রর। কিন্তু বর্তমানে সুরেনের জামাইবাবু বাড়িতে সেই মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় দীপ্তেন্দ্র। উপলব্ধি করে সেই মূর্তি চুরি করে আনা হয়েছে। শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো মানুষের মূল্যবোধ এই স্তরে নামতে পারে সেটা ভেবে স্থবির প্রায় হয়ে যায় দীপ্তেন্দ্র। অবশেষে প্রতিবাদের পন্থা খুঁজে পায় দীপ্তেন্দ্র নিজের অন্তরের মূল্যবোধকে জিতিয়ে। সংগে আনা বায়োডাটার কাগজের পেছনে খোলা চিঠি লিখে যায় বন্ধু সুরেনকে। চাকরীর আবেদন প্রত্যাহার করে কারন জানিয়ে দেয় বিস্তারিত। গল্পের শেষে এই মূল্যবোধের জয় দেখিয়ে সঠিক চেতনার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন লেখক। এখানেই গল্পটির স্বাতন্ত্র্য।

মধ্যবিত্তের আত্মসমীক্ষা লোকনাথ ভট্টাচার্য নানাভাবে তুলে এনেছেন তাঁর গল্পে। যে বৃত্ত যাপনে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত, কোন গল্পে তা আরও বাড়িয়ে দিয়ে এক রূদ্ধশ্বাস পরিবেশ তৈরী করেন। আবার কোন গল্পে সেই সংকট থেকে উত্তরণকেও দেখিয়ে দেন। আসলে লোকনাথ ভট্টাচার্যের চাওয়া তো ভাঙনের মধ্য দিয়ে জাগিয়ে তোলা শুদ্ধতর অনুভূতিকে। যে আত্মবন্দী মানুষকে দেখলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, যে গভীর অসুখ মানুষকে কেবলই দ্বীপবন্দী করতে চাইছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে অপরিচয়ের গণ্ডী –কখনো কখনো সেই রক্তক্ষরণ তিমির বিনাশী হতে চায়। 'কারারুদ্ধ' গল্পটি এমনই একটি উত্তরণের গল্প। কথকের বয়ানে জানা যায় তার পরিচয়। দিল্লী প্রবাসী, সরকারী চাকুরে সে। দীর্ঘকাল প্রবাসী হওয়ায় বাংলার জল হাওয়ার সঙ্গে যেন তার পরিচয়টা হারিয়ে গেছে। নতুন করে সেই পরিচয় জাগিয়ে নিতে, শরতের রোদ্দুর ঝলমলে বাংলার নিসর্গ ও গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা জীবনের স্বাদ পেতে কথক আসে বিষ্ণুপুরে। রেলের একটি বহুদিনের অব্যবহৃত বাংলোয় থাকার সুযোগ পেয়ে যায়। আর পেয়ে যায় মন্‌পা নামে বিহারী এক চৌকিদারকে। লেখকের আন্তরিক ব্যবহারে আপ্লুত মন্‌পা তার জীবনের কথা খুলে বলে কথককে। গল্পের মধ্যে শুরু হয় আর একটি গল্প। মন্‌পা জানায় একবার এক সরকারী অফিসার তার সুন্দরী স্ত্রী ও ফুলের মতো এক নিষ্পাপ শিশুকে নিয়ে এই বাংলোয় এসেছিল। উচ্চবিত্ত, উন্নাসিক ঐ মহিলা মন্‌পার ভাষায় 'লক্‌খী পিতিমে'র মতো হলেও রুক্ষভাষী। তার কটু ব্যবহারে মন্‌পা প্রথমদিন থেকেই বিরক্ত ছিল। তারপর যেদিন ঐ পরিবারের শিশুপুত্রটিকে মন্‌পার পুত্রের সঙ্গে খেলতে দেখে ক্রুদ্ধ মহিলা মন্‌পার শিশুকে একটি চড় মেড়ে তাড়িয়ে দেয় সেদিন থেকে ঐ 'লক্‌খী পিতিমে'র মতো মহিলার আচরণে মন্‌পার মন বিষিয়ে যায়, রিরি করে ওঠে রাগে। তাই পরদিন বাবা মার অগোচরে বাগানে খেলতে আসা শিশুটি যখন ঐ ভয়ঙ্কর অশ্বত্থ গাছের তলায় যায়, যেখানে কেউটের ছোবলে একটি গাভীর মৃত্যু হয়ছিল, মন্‌পা চুপ করে থাকে। শিশুটিকে সরিয়ে দেয় না। শুধু তাই নয় কেউটেটিকে লিকলিক করে শিশুপুত্রের কাছে যেতে দেখেও দাঁড়িয়ে থাকে এবং যখন ছোবল মারে তখনও নিস্পলক চোখে তাকিয়ে দেখে। শিশুটির মৃত্যু, তার মায়ের কান্না মন্‌পার মনে অপরাধবোধের সৃষ্টি করে। সে তো বাঁচাতে পারতো ইচ্ছা করলে শিশুটিকে। কিন্তু তার সন্তানের প্রতি ঐ মহিলার ঘৃনা তার মনেও ঘৃনার সৃষ্টি করে উচ্চবিত্ত স্বচ্ছল জীবনের প্রতি। পরের বছর বসন্ত রোগে মন্‌পার ছেলে বউ মারা যায়। সেই থেকে মন্‌পা একা। তার আত্মগ্লানি তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। আগন্তুক কথক চেষ্টা করে মন্‌পার মন হালকা করতে নানা কথায়। মন্‌পা হঠাৎই চায় কথকের সঙ্গে দিল্লী চলে যেতে। কারন তার অপরাধের কথা এতদিন কেউ জানে নি, শুধু জেনেছে এই কথক আর নিশ্চই বুঝতে পেরেছে কোন মনের অবস্থায় সে এই কাজ করেছে। লোকনাথ ভট্টাচার্য তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান মধ্যবিত্তের সঙ্কটকে। নিরাপদ জীবনে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত গন্ডীর বাইরে পা ফেলবে কেমন করে? মন্‌পাকে নিরস্ত করতে না পেরে কথক পালিয়ে যাওয়াই ঠিক করে।

ঘুন পোকা কাটে আমাদের মনের ভেতর কখনো কখনো। হঠাৎ ঐ আগন্তুকের ভেতরের মনুষ্যত্ব বোধ তাকে বাধা দেয় পালিয়ে যেতে।তার মনে প্রশ্ন জাগে। মন্‌পা যেন এক কারারুদ্ধ মানুষ তার আত্মগ্লানির কাছে। আজ সে মুক্তি পেতে চায়। অথচ কথক যা করছে তা কে জানে এক কারাগার হতে পালাতে চেয়ে হয়তো অন্য এক কারাগারকে আলিঙ্গন। শেষ পর্যন্ত লেখক নিজের সঙ্গে যুদ্ধে কারারুদ্ধ হতে হতে জয় করতে পারে মধ্যবিত্তের দ্বিধা। কথকের মনে হয়–

> "সাধারণ মানুষই আমি, ব্যার্থতাটা স্বীকারই করি অর্থাৎ শেষে আর পারলাম না, হার মানলাম। আমি তাই ফিরেই যাবো মন্‌পার কাছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ফিরে যাবই –এভাবে আমি পালাবো না।"[৯]

আর উপলব্ধি করে,

> "জগতের লোক যা খুশি বলে বলুক, পাগল ভাবে ভাবুক –আই ডোন্ট কেয়ার।"[১০]

এক কারাগার থেকে পালাতে চেয়েছিল কথক– যে কারাগার ছিল অমানবিকতার। শেষ পর্যন্ত আর এক কারাগারে রুদ্ধ হয় স্বেচ্ছায় – সে কারাগার মনুষ্যত্ব বোধের। অনায়াসে তাই কন্ডাক্টারকে বলে –

> "পরের স্টপে একটু থামাবেন ভাই? আমি নেমে যাব।"[১১]

স্বার্থপরতায় মগ্ন হতে হতে কখনো প্রয়োজন হঠাৎ আলোর ঝলকানির। আর সেই আলোতে খুলে যায় বৃত্ত যাপনের কারাগার। গল্পের কথকও তাই আত্মবন্দী কারাগার থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়ে যায় মন্‌পাকে ফিরিয়ে আনবার সিদ্ধান্তে।

লোকনাথের গল্পে মানুষের মননের সংকটের যে পরিচয় পাওয়া যায় 'কারারুদ্ধ' গল্প সেই সংকট থেকে শুদ্ধ সত্ত্বায় উত্তরণের গল্প।

'অসুখ' গল্পটিতে লোকনাথ ভট্টাচার্য মধ্যবিত্তের মানস সংকটের আর এক চেহারা তুলে এনেছেন। সকল মানুষের মাঝে থেকেও মানুষের মধ্যে কখনো কখনো জেগে ওঠে এক গভীর একাকীত্ব বোধ। জন্ম নেয় অবসাদ, ক্লান্তি ঘিরে ধরে আর হননের নেশায় আক্রান্ত হয়ে বিপন্ন মানুষ মুক্তি খোঁজে। গল্পটিতে মানুষের সেই গভীর অসুখের ছবি তুলে ধরেছেন গল্পকার।

ধনী পরিবারের সন্তান মৃন্ময়ীর সঙ্গে মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে হয় সুধীরের। তাদের একটি সন্তান খোকন। সুধীরের শাশুড়িও তাদের সঙ্গে থাকে। নানাভাবে অপমানিত করতে চায়, হেয় করতে চায় তার শাশুড়ি সুধীরকে। এই অপমানবোধ কখন সুধীরের মনে হিংস্রতার জন্ম দিয়েছে সে নিজেও জানে না। মনের এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে অদ্ভূত ভাবে সুধীরের জীবনে, কখনো সন্তানকে আদর করতে গিয়ে দুহাত দিয়ে তীব্রভাবে চেপে ধরে তাকে, কখনো শিশুটির মুখে ঘন ঘন ফুঁ দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করতে চায়। কখনো আয়নায় নিজের মুখ দেখে হিংস্র খুনী ভাবে, কখনো ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। তার অফিসের একটি মেয়ে চারতলা থেকে ঝাঁপালে সুধীরের মনে হয় আসলে মেয়েটিকে সে-ই ধাক্কা দিয়েছে। জীবনের একঘেয়েমী বিষন্নতা, অবসাদ যে বিপন্নতা তৈরি করে আধুনিক সময়ে মানুষের জীবনে যা থেকে জন্ম নেয় গভীর অসুখের। 'অসুখ' গল্পে লোকনাথ ভট্টাচার্য আধুনিক মানুষের সেই গভীর মানস সঙ্কটকে তুলে ধরেছেন।

গল্পের শেষে সুধীর আবার গতানুগতিক জীবনের একঘেয়েমিতেই ফিরে যায়। লেখক যেন দেখাতে চান এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি নেই কোথাও মানুষের। যে বোধ তাকে তাড়না করে আপাত সুখের মধ্যে, যে একঘেয়েমি তাকে ক্লান্ত করে তাই তাকে হননের পথে ঠেলে দেয়।

মানবিকতা বোধ থেকে স্খলন ঘটলে মানুষের মধ্যে সংকট তৈরি হয়। কখনো তা মানুষকে আত্মবন্দী করে, মানুষ দাহ্য হয়। আবার মানুষই পারে কখনো সেই দহন থেকে নিজের উত্তরণ ঘটাতে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের গল্পগুলি দাহ্য সময়ে মানুষের সেই দহন-কথা।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'আপনার কীর্তি'। এতে মাত্র তিনটি গল্প – 'আপনার কীর্তি', 'তি-তস-অন্তি', 'মধ্যরাতের নাচ'। গল্পগুলিতে লোকনাথ কোথাও ব্যক্তির সম্পর্কের সঙ্গে সংঘাত, কোথাও সমাজের তৈরি নিয়মের সাথে সংঘাত, কোথাও মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘাত দেখিয়েছেন।

'আপনার কীর্তি' গল্পে আছে বৃত্তবন্দী মানুষের যাপনের কথা। কখনো যদি মানুষ সেই বৃত্ত ভাঙতে চায় তবে সমাজ তাকে দূরে সরিয়ে দেয়– একাকী হয়ে যায় সেই মানুষ। গল্পে এক ভিখারী গান গেয়ে ভিক্ষে করে জীবন কাটায়, একদিন তার গলায় অসুখ হলে সে গাইতে পারে না। যে পথে সে ভিক্ষে করতো সেখানে এক বিত্তশালী মানুষ - সামাজিক অবস্থানে এই ভিখারীর সঙ্গে যার দূরত্ব অনেকখানি হঠাৎ করে সে এই মানুষটিকে সাহায্য করতে নেমে যায়। ভিখারীর সঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে পথে নামে। মধ্যবিত্ত মানুষটির এই চেষ্টা সকলের কাছে তাকে হাস্যকর করে তোলে। তার স্ত্রী-কন্যা অপমানিত বোধ করে। লেখক দেখাতে চান আত্মকেন্দ্রিকতা মধ্যবিত্ত যাপনের অঙ্গ। মানুষ যেন এই সমাজ দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন বন্দী। এ বিচ্ছিন্নতা যে দূরত্ব সৃষ্টি করে তা কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানুষকে বিপন্ন করে। অথচ এ সামাজিক ব্যাধি দূর করতে গেলে মানুষ হাস্যকর হয়ে ওঠে। মানুষের সাথে মানুষের সেতু বন্ধনের চেষ্টা ব্যার্থ হয়।

'তি-তস-অন্তি' গল্পটি স্মৃতিচারনা মূলক। খুব স্বল্প দৈর্ঘের এই গল্পে লেখক একটি চরিত্রের বাল্যস্মৃতিতে পাঠশালায় সমবেত কণ্ঠে 'তি-তস-অন্তি' পাঠের চিত্র তুলে এনেছেন। গল্পটি প্রতীকী। নিজের ঘেরাটোপে বন্দী হতে হতে মানুষ প্রতিদিন একা হচ্ছে। লোকনাথ ভট্টাচার্য সেই একা মানুষের যন্ত্রনা দেখেছেন। সমবেত পাঠ আসলে একার বহু হওয়া। আর যতক্ষণ মানুষ সমবেত না হচ্ছে ততক্ষন মানুষে মানুষে বন্ধন গড়ে উঠতে পারে না। গল্পের শেষে স্মৃতিচারণায় যুক্ত মানুষটির মনে হয় –

> "এক দুই হবে, দুই বহু হবে, ...আমি ভাবব, তুমি ভাববে, আমরা দুজনে ভাবব, আমরা সকলে ভাবব, জয় পুনরাবৃত্তি।"[১২]

আর এই পুনরাবৃত্তির মধ্যেই থাকে মানুষের সাথে মানুষের সেতুবন্ধনের কথা।

'মধ্যরাতের নাচ' গল্পে লেখক এক বিশ্বাসের ছবি তুলে এনেছেন। গল্পের কথক মধু ও শান্তার জীবন বহুদিন থেকেই বিচ্ছিন্ন। মধু জানতো শান্তার মৃত্যু হয়েছে। ত্রিচূড়ে বেড়াতে এসে মধ্যরাতের এক নাচের আসরে মধু শান্তাকে দেখতে পায়। আলো-আঁধারী আবছায়ায় সে বুঝতে পারে না শান্তা জীবিত না অশরীরী। একদা শান্তার ইচ্ছেতেই তাদের সন্তানকে ভ্রূন অবস্থায় তারা মেরে ফেলে। অথচ সেই জন্ম না হওয়া সন্তানকে ফিরে পেতে চেয়েছিল শান্তা। সেই মুহূর্তে মধু অনুভব করেছিল জীবনের স্পন্দনকে। আজ শান্তার সেই রহস্যময় উপস্থিতি মধুকে উত্তেজিত করে আত্মহত্যার জন্য। কিন্তু মধু বিশ্বাস করে জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যেই আছে উত্তরণ। হয়তো তা সংগ্রামের তবু তা বিশ্বাসের। মধু অনুভব করে মানুষ বাঁচে আর সে বাঁচা মুহূর্তে মুহূর্তে। গল্পটিতে এই সময়ের মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কটের ছায়া ধরা পড়েছে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের গল্প প্রসঙ্গে অলক রায় মন্তব্য করেছেন-

> "লোকনাথ ভট্টাচার্যের সব গল্পেই জীবনকে জানার বোঝার একটা প্রয়াস দেখা যায়।"[১৩]

গল্পগুলি পাঠে এই মন্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের গল্পের অন্যতম প্রবণতা মধ্যবিত্ত মানুষের অন্তঃসঙ্কটকে তুলে ধরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্তের যে মানস সংকট গল্পগুলিতে রয়েছে তারই প্রকাশ। কোথাও আছে সঙ্কটের তীব্রতা, কোথাও আছে সংকটমুক্তি। যে সময়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সাধারণ সংঘাতের কথা গল্পে উঠে আসছিল সে সময় এক স্বতন্ত্র ধরণের রচনাভঙ্গিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন তিনি ছোটগল্পকে নিয়ে। তাতে কখনো এসেছে অস্তিবাদী চেতনার প্রভাব, কখনো এসেছে ফরাসী নব্য সাহিত্যের প্রভাব আবার কখনো ফরাসী গোয়েন্দা গল্পের উত্তেজনা। এক নতুন ভাবনা ও আঙ্গিক সচেতনতা তার গল্পগুলিকে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, লোকনাথ, উপন্যাস ভাবনা, বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অন্বীক্ষা (সম্পাঃ বীতশোক ভট্টাচার্য), এবং মুশায়েরা, পৃ. ২৮
২. ভট্টাচার্য, বীতশোক, নিবেদন অংশ, লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী-৬, এবং মুশায়েরা, পৃ. ১০
৩. তদেব, পৃ. ৪২
৪. তদেব, পৃ. ৫৮
৫. তদেব, পৃ. ৫৮
৬. তদেব, পৃ. ৭৪
৭. তদেব, পৃ. ৭৫
৮. তদেব, পৃ. ৭৬
৯. ভট্টাচার্য, লোকনাথ, কারারুদ্ধ, লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী-৬, পৃ. ১৪৫
১০. তদেব, পৃ. ১৪৫
১১. তদেব, পৃ. ১৪৫
১২. ভট্টাচার্য, লোকনাথ, তি তস্ অন্তি, লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী–৬, পৃ. ১৮৫
১৩. রায়, অলোক, ভূমিকা, লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী–৬, পৃ. ২০